ধারাবাহিক রচনা

কলকাতায় প্লেগ : ভগিনী নিবেদিতা ও সমসময়

স্বামী ঋতানন্দ

নিবেদিতার অদম্য সেবার কথা লোকের মুখে মুখে সরকারি দপ্তরে পৌঁছয়। সরকারের হেল্‌থ-অফিসার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি ভেবেছিলেন, কোনও এক কমিটি তাঁকে অভ্যর্থনা করবে। কিন্তু এসে দেখলেন, কাগজপত্র ছড়ানো ডেস্কের সামনে এক ব্যস্ত মেয়ে বসে নিবিষ্ট মনে কাজ করছে। নিবেদিতা অফিসারকে জানান, ''বাগবাজারটা আমরা বাঁচাব ঠিকই। সাধারণের জন্য সাধারণই এখানে খাটছে।... আমার সহকারীরা সন্ন্যাসী। তাঁরা রাস্তা জঞ্জাল পরিষ্কার করছেন, মেথর খাটছেন। দিনে আঠারো ঘণ্টা তাঁরা খাটেন, কাজকে মনে করেন দেবসেবা।''[৬৫]

ছাত্র-স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ বাড়তে থাকে। তারা চাঁদা তোলে, বাড়ি-বাড়ি বীজঘ্ন বিলি করে এবং স্বাস্থ্যসংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধের সতর্কবাণী হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে প্রত্যেক পাড়ায় বিতরণ করে। এতে যে তাদের দেশের জন্য সেবাব্রতে হাতে-খড়ি হচ্ছে, এর মর্ম তারা হয়তো তখনই বোঝেনি। এই আত্মত্যাগের মধ্যে নাগরিকজীবনের এক নতুন আদর্শ রয়েছে, সময় পেলেই নিবেদিতা তা ছাত্রদের বুঝিয়ে দেন। তখন নিবেদিতা যেন অদম্য এক প্রেরণার উৎস। অবিরাম কথা বলেন ছেলেদের সঙ্গে। বলেন, ''ঝাড়ুদারও যদি একটা আদর্শের প্রেরণায় কাজ করে, তাহলেই বৃহত্তর আদর্শের জন্য তার প্রস্তুতি হয়ে গেল। সে-আদর্শ কী? সেটা ঠিক করে নেওয়া তোমাদের দায়। বাগবাজারকে রক্ষা করে আমরা নতুন প্রাণ নিয়ে ভারতের ইতিহাস রচনা করলাম। এ-ইতিহাস আগে কখনও লেখা হয়নি। এই আমাদের রামায়ণ।''[৬৬] নিবেদিতার মুখে ভারত সম্পর্কে 'আমাদের' কথাটি শুনতে শুনতে ছাত্ররা বিহ্বল হয়ে যেত আর কাজে পেত অক্লান্ত উৎসাহ।

নিবেদিতার অসীম সাহসিকতাপূর্ণ এই ঐকান্তিক সেবাকার্য তাঁর ব্রাহ্মবন্ধুদেরকেও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রণোদিত করল। বিখ্যাত সেবাব্রতী ডা. রাধাগোবিন্দ কর লিখেছেন, ''এই সঙ্কট-সময়ে বাগবাজার পল্লীর প্রতি বস্তীতে ভগিনী নিবেদিতার করুণাময়ী মূর্তি লক্ষিত হইত। আপনার আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি অপরকে সাহায্য দান করিতেন। একবার একজন রোগীর ঔষধপথ্যাদির ব্যয়-নির্বাহার্থে তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য দুগ্ধপান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তখন দুগ্ধ ও ফলমূলই ছিল তাঁহার আহার।''[৬৭]

বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের আশেপাশের

রাস্তাগুলির পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার দায়ভার নিবেদিতাই গ্রহণ করেছিলেন। মহিলাদের এক-একটা ঝুড়ি দিয়ে বলতেন—সব আবর্জনা এতে ফেলবে। নর্দমা অবধি রাস্তার ধার-পাশ তারা পরিষ্কার করে রেখেছে কি না খোঁজ নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে নিবেদিতা বাইরে যেতেন। এই সামান্য নিয়মটুকু তাদের মানাতে কী বিপুল আয়াসই না তাঁকে করতে হয়েছে! বারে বারে মেয়েদের বুঝিয়েছেন, এসব ব্যবস্থার সঙ্গে প্লেগ-সংক্রমণ নিবারণের সম্পর্ক কত গুরুতর। কিন্তু তারা তা ধরতে পারে না। মুখে হাসি নিয়ে সিস্টারের কথাগুলো শুনে যায়—ওই পর্যন্তই। বাস্তবে তার প্রয়োগের আশা যেন সুদূরপরাহত। সিস্টার দু-দিন ধরে তাদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে শেষে হাল ছেড়ে দেন। তৃতীয় দিন খুব ভোরে ঝাড়ু নিয়ে নিজেই রাস্তা ঝাঁট দিতে শুরু করেন। মেয়েরা এ-দৃশ্য দেখে লজ্জিত হয়ে বাড়ির মধ্যে গিয়ে মুখ লুকোল। বিকেলের মধ্যে পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল এ-খবর—''আমরা যদি রাস্তা ঝাঁটপাট না দিই, সিস্টার নিজে দেবেন।'' ব্যস, সব ঠিক হয়ে গেল এক নিমেষেই। পাড়ার যুবকেরা লজ্জিত হয়ে রাস্তা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করল।[৬৮]

পরবর্তী কালে প্লেগ-সেবাকাজের বিচিত্র কিছু অভিজ্ঞতার বর্ণনা সিস্টার তাঁর প্রবন্ধ 'The Plague'-এ দিয়েছেন। আমরা আগেই জেনেছি প্লেগ রোগ একটা পর্যায়ে চলে গেলে তার নিরাময় অসম্ভব। সেক্ষেত্রে রোগীর থেকে সংক্রমণ রোধের জন্য তাকে স্বতন্ত্র স্থানে সরিয়ে নিতে হয় এবং মৃত্যু সেখানে সময়ের প্রতীক্ষা মাত্র। প্লেগের ক্ষেত্রে প্রতিরোধের মাধ্যমে সংক্রমণ রোধ করা প্রয়োজন। নিবেদিতা ও রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকর্মীরা সেবিষয়ে অত্যন্ত ওয়াকিবহাল ও সচেতন ছিলেন। নিবেদিতা লিখছেন : ''প্রতিরোধ করা যায় এমন বিষয় দুটি হল : ১) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং ২) অজ্ঞতা। তাই প্লেগের অন্যতম ও সেইসঙ্গে সর্বোত্তম দান হল নিম্নবর্ণের মানুষদের মনুষ্যপদবাচ্য হওয়া। এই মুহূর্তে তাদের কায়িক শ্রমের চাহিদা প্রচণ্ড। মেথরদের ফুটফুটে বালকও এখন সময়ের স্বল্পতা, প্রবল উৎসাহ ও কর্মোদ্যমের কারণে পূর্ণবয়স্কের মজুরির দাবিদার। ওরা যখন দল বেঁধে বালতি হাতে ও কোদাল কাঁধে আসে তখন তাদের কতই না গর্বিত বলে মনে হয়! একটা যুগের মহৎ এক উদ্দেশ্য রূপায়ণে সবকিছু কেমন ঐক্যবদ্ধভাবে ঘটে যাচ্ছে—এ এক বিস্ময়ের ব্যাপার...।[৬৯]

''যাইহোক, এই ছেলেগুলির পরে কী হবে তা নিশ্চিত না থাকলেও আপাতত মজা ও উৎসাহে পরিপূর্ণ। অত্যন্ত নোংরা কোনও নর্দমা তত্ত্বাবধানে ধৈর্য ও উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে।

''সর্বাপেক্ষা অসহ্য বিষয় হল বাসস্থানের ঘরের কাছে এবং সেগুলোর মাঝখানে বাঁশের তৈরি একসারি শৌচাগার। এগুলো এবং যে জলাশয়ে অনবরত বস্তির নোংরা জল এসে পড়ে—সেগুলো হল শহরের স্থায়ী উৎপাত। এগুলো একেবারে উঠে না গেলে উপযুক্ত পরিচ্ছন্নতা আনা সম্ভব নয়। একথাও সত্য যে এরকম অবস্থা অনেকদিন ধরেই চলছে। এটা নতুন গজিয়ে ওঠা ব্যাপার নয়। সমস্যাগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে কোথাও না কোথাও এসে পরিশ্রম নিষ্ফল ও হতাশাজনক হয়ে পড়ছে। আমাদের কর্মীরা কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত এমন জঘন্য নর্দমা দেখতে পাচ্ছে যেগুলো পরিষ্কার করা স্বয়ং হেরাক্লিসের পক্ষে অসম্ভব হত। সেখানকার বাসিন্দারা মুসলমান; তাদের সঙ্গে সবসময় থাকে মুরগি ও ছাগল—আর তা নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রবল বিশৃঙ্খলা।''

নিবেদিতা-লিখিত ওই 'The Plague' প্রবন্ধ থেকে জানতে পারছি কী দুঃসাহসিক ও শ্রমসাধ্য কাজেই না তাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন : ''... কিন্তু সেই

ভয়ঙ্কর গর্তটি থেকে সামান্য একটা জলের ধারা বার করতে আমাদের ২০ জন লোককে একসপ্তাহ খাটতে হয়েছে। ওরা বলে ওখানে ১৫ বছর কারোর হাত পড়েনি।"

নিবেদিতার এই রক্তক্ষয়ী পরিশ্রমের অধুনা-স্বীকৃতি : "Thus did Nivedita teach the people of Calcutta their first lessons in sanitation, self-help and social service, not by precept but by practice."[৭০]

নয়

নিবেদিতার কার্যকলাপ বিষয়ে নিয়মিত খোঁজখবর রাখতেন স্বামীজী। রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দও নিবেদিতার জন্য কম উদ্বিগ্ন ছিলেন না। মরণের অগ্রদূত প্লেগের সেবা করতে গিয়ে বেপরোয়া হয়ে নিবেদিতা নিজ জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছিলেন। নিবেদিতা ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগ-সেবাকার্যের কথা দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে আলোচিত হতে থাকে। সেসময় স্বামী সারদানন্দ গুজরাতে বেদান্তপ্রচারে নিরত। সেখান থেকে ফিরে ১৯ মে ১৮৯৯ তারিখে ম্যাকলাউডকে পত্র লিখলেন। নিবেদিতার প্রতি একইসঙ্গে স্নেহ ও শ্রদ্ধার অপূর্ব প্রতিফলন সে-পত্রে :

''মার্গট দ্রুত তৈরি হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে একটা চুক্তি করা দরকার, যদি সে আমাকে সঙ্গে নেয়!! সে গতকাল, এবং তার আগের দিন এখানে এসেছিল। আমি তাকে সেই ছোট টেবিলটিতে চা খেতে দিলাম। স্বামীজী ও তুরীয়ানন্দের বার্থ রিজার্ভেশন (পাশ্চাত্যযাত্রার) বিষয়ে আমরা কথা বললাম, বাক্সপ্যাঁটরা কেনাকাটা বিষয়েও,—পরে স্বামীজীর সঙ্গে পরামর্শও হল। মার্গট আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছে, আর প্লেগ-সেবার বিষয়ে একটু বাড়াবাড়ি-উৎসাহ দেখিয়েছে। এখনো পর্যন্ত আমাদের পক্ষে প্লেগ-সেবায় নার্স যোগান দেবার প্রয়োজন হয়নি—কিন্তু 'প্রিয় বালিকাটি' (dear girl) দুবার জীবন বিপন্ন করে তা করেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে রক্ষা পেয়েছে—তাকে আরও বহুবছর আমাদের মধ্যে পাব। বর্তমানে প্লেগ কিছু কমতি—কিন্তু পরের শীতে আরও ব্যাপকভাবে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। মার্গট এখন বুঝেছে, তার শক্তি সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে—নিজের জীবনকে মূল্যহীন ভেবে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত নয়। তুমি এ বিষয়ে তাকে দু'এক লাইন লিখতে পারো।"[৭১]

প্লেগ-সেবাকার্যের প্রায় সূচনালগ্নে ঘটেছিল একটি আবেগমথিত দুঃসাহসিকতা। কলকাতা-পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এক 'লোকমাতা'-র পূর্ণ রূপ। সে-রূপ প্লেগাক্রান্ত বালকক্রোড়ে এক নারীর মাতৃপ্রতিমা। সে-নারী এক বিদেশিনী। অন্তরঙ্গ মহল এ-সংবাদে সিস্টারের ধন্যধ্বনিতে পূর্ণ। কিন্তু স্বামীজী কঠিন ভাষায় নিবেদিতাকে এইধরনের আতিশয্যপূর্ণ কাজ থেকে নিবৃত্ত করেন। অকারণ অ্যাডভেঞ্চার সাময়িক তৃপ্তি দিতে পারে, কিন্তু তা জীবনব্যাপী কঠোর সেবাযজ্ঞের প্রতিকূল। আগেই বলা হয়েছে, প্লেগে আক্রান্ত হলে রোগীর মৃত্যু তৎকালে অবশ্যম্ভাবী বলে ধরেই নিতে হত। সেক্ষেত্রে সাবধানতার সঙ্গে শুশ্রূষার সঙ্গে প্রয়োজন রোগ সংক্রমণকে প্রতিরোধ করা। তার বদলে নিবেদিতা যেন আগুন নিয়ে খেলছেন। নিজের প্রাণ নিয়ে অকারণ ছিনিমিনি খেলার অধিকার সেবকের নেই—যদিও যুক্তি একথাই বলে, তবুও মহাপ্রাণেরা যুগে যুগে নিজের প্রাণ বাজি রেখেই সেবাযজ্ঞে নিজেদের বলি দেন। এ হল চিরপুরাতন-চিরনূতন রীতি। স্বামীজী কি সদ্যকেনা মঠের জমি এক প্লেগ-সেবাকাজের জন্য বিক্রি করে দিতে চাননি আগের বছরই? প্রজ্ঞাময়ী সারদা দেবী তখন কঠোর হাতে তা সামলেছিলেন। হৃদয়—হৃদয়ধনের প্রয়োগে গুরু-শিষ্যা কেউই খুব একটা

কম ছিলেন না।

যাই হোক, নিবেদিতা প্রাণ বাজি রেখে সেবারের সেই সেবাকাজ করতে গিয়ে কতটা বিপন্নতার শিকার হতে পারতেন, তার বর্ণনা পাওয়া যায় প্রত্যক্ষদর্শী ড. রাধাগোবিন্দ করের বয়ানে। তাঁর লেখনীতে সেই আত্মাহুতির বিবরণ :

''১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্লেগ সংহারকরূপে দেখা দেয়। পূর্ববৎসর তার আবির্ভাব সূচনায়, বিধিব্যবস্থা-বিভীষিকা ভয়ে ভীত জনগণ শহর থেকে পলায়ন করে।... এই বছর ছোটলাট স্যার জন উডবার্ন আশ্বাস দেন, কোনও রোগীকে বলপূর্বক গৃহান্তরিত করা হবে না।... সেই সময় একদিন চৈত্রের মধ্যাহ্নে রোগ-পরিদর্শনান্তে গৃহে ফিরে দেখলাম, দ্বারপথে ধূলিধূসর কাষ্ঠাসনে একজন ইউরোপীয় মহিলা উপবিষ্টা। ইনিই ভগিনী নিবেদিতা, একটি সংবাদ জানার জন্য আমার আগমন-প্রতীক্ষায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করছেন।

''সেইদিন প্রাতে বাগবাজারে কোন বস্তীতে আমি একটি প্লেগাক্রান্ত শিশুকে দেখিতে গিয়েছিলাম। রোগীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই সিস্টার নিবেদিতার আগমন। আমি বলিলাম, 'রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।' বাগদীবস্তীতে কিরূপে বিজ্ঞান-সম্মত পরিচর্যা সম্ভব, তাহার আলোচনা করিয়া আমি তাঁহাকে বিশেষ সাবধান হইতে বলিলাম। অপরাহ্নে পুনরায় রোগী দেখিতে যাইয়া দেখিলাম, সেই অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে, সেই আর্দ্র-জীর্ণ কুটীরে, নিবেদিতা রোগগ্রস্ত শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন তিনি স্বীয় আবাস পরিত্যাগ করিয়া সেই কুটীরে রোগীর সেবায় নিযুক্তা রহিলেন। গৃহ পরিশোধিত করা প্রয়োজন। তিনি স্বয়ং একখানি ক্ষুদ্র মই লইয়া গৃহে চুনকাম করিতে লাগিলেন। রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও তাঁহার শুশ্রূষায় শৈথিল্য সঞ্চারিত হইল না। দুইদিন পরে শিশু এই করুণাময়ীর স্নেহ-তপ্ত অঙ্কে অন্তিম নিদ্রায় নিদ্রিত হইল।''[৭২]

মৃত্যুর আগে শিশুটি নিবেদিতাকেই জননী মনে করে জড়িয়ে ধরে মা-মা বলে ডেকেছিল। শিশুটির অসহায় মৃত্যু তাঁকে অধীর করেছিল। 'The Plague' প্রবন্ধে তারই হৃদয়মথিত সকরুণ নিদারুন বর্ণনা :

'' 'দিদি, আপনার একজন রোগী আছে'। দরজায় ডাক্তারের গলা। তিনি কী বলছেন, তখনই বুঝতে পারলাম। আমার প্রথম প্লেগের রোগী। কয়েক মিনিট পর আমরা একটা কুঁড়েঘরে ঢুকলাম, সেখানে রোগী শুয়ে আছে। সাধারণ মাটির কুটির, ছোট্ট ছোট্ট অন্ধকার খুপরি, সামনে খোলা উঠোন। একটা ঘরে পরিষ্কার কাপড়ের স্তূপ, কারণ এরা ধোপা। আর একটা ঘরে রয়েছে গরু। ঢোকার পর প্রথম কাজ ছিল রোগীকে বন্ধ ঘর থেকে বাইরে বারান্দায় ছোট কাঠের খাটে এনে শোয়ানো। অসহায় বাচ্চাটি নিস্তেজ হয়ে শুয়ে আছে, বারো-চোদ্দো বছরের ফুটফুটে সুন্দর ছেলে। গত সন্ধ্যা থেকে অসুস্থ। এখন সকাল নটা। উপসর্গ সামান্য বেড়েছে। সাবধানে থাকতে বলে ডাক্তারবাবু এরকমই আরেকটা রোগী দেখতে চলে গেলেন।

''করার কিছুই ছিল না। পথ্য ও ওষুধ খাওয়ানো, স্নান করানো—এইমাত্র। হ্যাঁ, মাথার চুল কেটে বরফ দেওয়া যেত, হাওয়া করাও যেত। কিন্তু এসব করার পরেও শুধু বসে থাকা আর বাঁচানোর আশা ত্যাগ করে মরতে দেখা। কারণ, এরপরই ওই ছেলেটির যে-কষ্ট শুরু হবে তারও ভয়ঙ্কর তীব্রতার কথা যে জানে, যে ওর অপুষ্টির কথা জানে—এই যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে তার কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। সন্ধে হলেই ছেলেটি মারা যাবে। ডাক্তারবাবুর তাই অভিমত। আমি সেরকম ভাবিনি। যদি ভাবতাম তাহলে ওর মাকে ওখান থেকে

সরাতে পারতাম না। এখন ওকে সরিয়ে দিয়েছি, যদিও সরাতে খুব কষ্ট হয়েছে; কারণ, আমার মনে হয়েছে, এখন আমার একমাত্র কর্তব্য রোগীকে পৃথক স্থানে রাখা ও সংক্রমণ এড়ানোর চেষ্টা করা।... ছেলেটি এখন ছটফট করছে, তাকে শান্ত রাখাই এখন একমাত্র কাজ। একটি দুর্ভাগ্যজনক অঙ্গসঞ্চালন তার মৃত্যু ডেকে আনতে পারে।...

''শেষ সময় এসে গেল।... মুহূর্তগুলো যেন কত দীর্ঘ। শেষদিকে ও অস্থির হয়ে উঠল। কিছুক্ষণের জন্য 'হরিবোল' বলার খুব চেষ্টা করল। আমি কথার খেই ধরে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে 'হরিবোল' বলতে লাগলাম। ছেলেটা আশ্বস্ত হয়ে বালিশে মাথা রাখল। তারপর সে শান্ত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে নিশ্বাস ক্ষীণ হতে হতে ছেলেটি মারা গেল।''

লক্ষণীয়, শিশুটির অন্তিমলগ্নের বিবরণ এখানে আছে। আছে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বর্ণনাও। নেই শুধু সিস্টার নিজে মূর্তিমতী করুণার রূপধারণ করে কীভাবে সেই শিশুটির সেবায় নিজেকে নিবেদন করেছিলেন—তার উল্লেখ। অবশ্য তা না থাকারই কথা। স্বামীজীর ভাবাদর্শে সেবারূপ পূজার প্রথম শর্ত আত্মবিলয়। সে-সাধনাতে নিবেদিতা হয়ে উঠেছিলেন সমর্থা ও সিদ্ধা। ইতিহাস শেষপর্যন্ত সবকিছুকে লুপ্ত করতে চায় না ও করতে পারেও না। কারণ, তাহলে যে এ-জগৎ থেকে যা কিছু শ্রেয়ের বীজ, শুভের বীজ, মঙ্গলের বীজ—তা নিঃশেষে লোপ পেয়ে যেত। কালপ্রবাহ মহাকালের কপোলতলে বিলীন হতে হতে রেখে যায় কিছু চিরন্তন বীজকণা। গবেষকদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি একদিন খুঁজে পায় তাকে। এবং সেই কয়েকটি অজর অমর সুপ্ত বীজকণা দিয়েই সভ্যতা-অরণ্য রচিত হতে পারে। ডা. রাধাগোবিন্দ কর প্রমুখ প্রত্যক্ষদর্শীর জহুরিদৃষ্টি নিবেদিতার 'লোকমাতা'-রূপের অমরদ্রষ্টা। ভারতসেবায় বলিপ্রদত্ত এক পাশ্চাত্য নারীর সেই মাতৃরূপের বীজকণাটি মানবজাতির আধুনিক নবপুরাণ রচনার অন্যতম রসদ।

দশ

১১ মার্চ ১৮৯৮। স্টার থিয়েটারে 'ইংল্যান্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার প্রভাব' বিষয়ে বক্তৃতা করবেন নিবেদিতা। সভাপতির আসনে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রোতাদের কাছে নিবেদিতার পরিচয় দিতে গিয়ে স্বামীজী বললেন : ''ইংলন্ড আমাদের আর একটি উপহার দিয়াছে—মিস মার্গারেট নোবল। ইহার নিকট আমাদের অনেক আশা।''[৭৩] লোকসমক্ষে বলা স্বামীজীর উক্তি অনুসারে পাশ্চাত্যকন্যা নিবেদিতা ভারতবর্ষের কাছে এক 'উপহার' তো বটেই, তবে প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের কাছে এ হল স্বামীজীর ঋণ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্বামীজী নিবেদিতাকে পত্রে লিখেছিলেন—''ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে।''[৭৪]

ইংল্যান্ড থেকে নিবেদিতাকে স্বামী বিবেকানন্দ 'ধার' করে এনেছিলেন। আর ধার করার আগেই ধারশোধ করে দিয়ে এনেছিলেন। একথা স্বীকার্য যে, আমেরিকা বিজয়ের পর পাশ্চাত্যের যে-স্থানে তিনি তাঁর প্রাণশক্তি সবচেয়ে বেশি ক্ষয় করেছিলেন তা হল ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডের একদা-বিবেকানন্দপ্রেমী মিস মুলার ও মি. ই টি স্টার্ডি বছর কয়েকের মধ্যেই স্বামীজীর নামে নিন্দা-সমালোচনার ঝড় তুলেছিলেন। আত্মপক্ষ সমর্থন চিরদিনই স্বামীজীর অত্যন্ত অপছন্দের। তবুও সেই কুৎসার ফলে পুনঃপুনঃ কাজের ব্যাঘাত ঘটায় যন্ত্রণায় দীর্ণ বিবেকানন্দ ১৮৯৯-এর নভেম্বরে মি. স্টার্ডিকে এক পত্র লেখেন। অনেক কথার মধ্যে

লিখলেন : ''তোমাদের সমালোচনায় আমার আর কোন আস্থা নেই—এসব বিলাস-ব্যসনের কথায় আর কান দিই না, স্মৃতিতে ভেসে উঠছে অন্য এক দৃশ্য। সেই কথাই লিখছি।...

''ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ারের কথা বাদ দিলে ইংলণ্ড থেকে আমি রুমালের মতো একটুকরো বস্ত্র পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। অথচ অপর পক্ষে ইংলণ্ডে আমার শরীর ও মনের উপর অবিরত পরিশ্রমের চাপের ফলেই আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। তোমরা—ইংরেজরা আমাকে এই তো দিয়েছ, আর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছ অমানুষিক খাটিয়ে।... তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে একটি কোট দিয়েছ, বলতে পারো? কেউ একটা সিগার? এক-টুকরো মাছ বা মাংস? তোমাদের মধ্যে এ-কথা বলবার দুঃসাহস কার আছে যে, তোমাদের কাছে আমি খাবার, পানীয়, সিগার, পোশাক বা টাকা চেয়েছি?...

''লণ্ডনে আমাকে যেমন অন্ধকার গর্তটির ভেতর রেখেছিলে এবং সর্বক্ষণ পরিশ্রমে ও অনাহারের মধ্যে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিলে, তোমার সন্তানের বেলায় তা করতে পারতে কি? মিসেস—কি তা করতে চাইবেন?...

''প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে তুমি অনেক কথা বলেছিলে। সেই ভারত আজও বেঁচে আছে... এখনও সে মরেনি, আজও সেই জীবন্ত ভারত নির্ভীকভাবে ধনীর অনুগ্রহের তোয়াক্কা না রেখে তার নিজস্ব বাণী প্রচার করার মনোবল রাখে; কারও মতামতের পরোয়া সে করে না, এদেশে—যেখানে তার পায়ে শিকল আঁটা কিংবা শিকলের প্রান্তভাগ যারা ধরে আছে, সেই শাসনকর্তাদের মুখের সামনেও করে না। সেই ভারত আজও বেঁচে আছে..., অম্লান প্রেমের, চিরস্থায়ী বিশ্বস্ততার চিরন্তন ভারতবর্ষ—শুধু রীতিনীতিতেই নয়, প্রেমে, বিশ্বাসে ও বন্ধুত্বে। সেই ভারতের একজন নগণ্য সন্তান হিসাবে আমি তোমাকে ভালবাসি ভারতীয় প্রেমে, এবং এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে তোমায় সাহায্য করার জন্য আমি সহস্রবার শরীরত্যাগে প্রস্তুত।

চিরদিন তোমার—বিবেকানন্দ''[৭৫]

এই বিবেকানন্দের মানসকন্যা নিবেদিতা। ত্যাগ ও সেবার নৈবেদ্য। আত্মাহুতির সমিধ।

মার্গারেটকে ৭ জুন ১৮৯৬, স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন : ''জগৎকে আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের ধারা; হায়! যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে! পৃথিবীর যারা বীরোত্তম ও সর্বোত্তম, তাদের আত্মোৎসর্গ করতে হবে 'বহুজন-হিতায়, বহুজনসুখায়।' অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন।

''জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত। জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন—চরিত্র। নিঃস্বার্থ, অগ্নিজ্বলন্ত প্রেম যাঁদের মধ্যে—তাঁদের এখন জগৎ চায়। সেই প্রেম প্রতিটি উচ্চারিত শব্দকে বজ্র করে তুলবে।''

স্বামীজী নিবেদিতাকে আরও লিখেছিলেন : ''জগতের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ, আর সবচেয়ে সাহসী, যাতনাই তাদের বিধিলিপি...।''[৭৬] ''যে মানুষ সত্যই জগতের দায় ঘাড়ে তুলে নেয়, সে জগৎকে আশীর্বাদ করে নিজের পথে চলে যায়। তার মুখে নিন্দা বা সমালোচনার একটি কথাও শোনা যায় না।'' (৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৯) স্বামীজী শিখিয়েছেন : ''... অত্যধিক ভাবপ্রবণতা কাজের বিঘ্ন করে। 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'—এই মূল মন্ত্র।''(৩ নভেম্বর, ১৮৯৭) '' 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'—(কল্যাণকারী কেউই দুর্গতিপ্রাপ্ত হয় না)।''[৭৭] ''পূর্ণ বিকশিত আসক্তি, এবং পূর্ণ বিকশিত অনাসক্তি মানুষকে সুখী ও মহান করে।...''(২৮ মার্চ, ১৯০০) ''শ্রী ওয়া গুরু, শ্রী ওয়া গুরু। ক্ষত্রিয়-শোণিতে তোমার জন্ম। আমাদের

অঙ্গের গৈরিকবাস তো যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুসজ্জা!"[৭৮]

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯০২ শিষ্যা নিবেদিতাকে লেখা শেষ পত্রে শিবগুরুর আশীর্বাদ : ''সর্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্বুদ্ধ হোক, মহামায়া তোমার বাহুতে ও হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন! অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হোক এবং সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে অসীম শান্তিও তুমি লাভ করো—এই আমার প্রার্থনা।...

''যদি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য হন, তবে যেমনভাবে তিনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে, কিংবা তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশি স্পষ্টভাবে তিনি তোমাকেও যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।"

স্বামীজী তাঁর পত্রগুলিতে যে শক্তি-ভাববীজ ব্যক্ত করেছিলেন, সেগুলি তাঁর কল্পনাবিলাসমাত্র নয়। এই ভাবশক্তিগুলি শিষ্য নিবেদিতার অস্থি-মেদ-মজ্জা-শোণিতের কোষে কোষে কণায় কণায় সঞ্চারিত হয়ে রক্তমাংসের জীবন্ত মানসকন্যা প্রতিমার এক নিখাদ, নিরঙ্কুশ, সাকার রূপদান করেছিল। নিরন্তর সাধনার দহন জ্বলনে নিবেদিতা স্বয়ং হয়ে উঠেছিলেন এক অক্ষয় বজ্র। তাঁর জীবনপথ অহং থেকে বিনতা, আত্মপ্রতিষ্ঠা থেকে আত্মবিলয়ে লীন হয়ে গিয়েছিল।

এগারো

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন থেকেই উদ্ভূত, তাঁতেই স্থিত, আবার তাঁতেই পর্যবসিত। শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গীকার : ''যদি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করে একজনের উদ্ধার সাধন করতে পারি, তাহাও সার্থক বোধ করি।"[৭৯] শ্রীমা সারদা দেবীর স্বীকারোক্তি : ''আমরা যদি পাপতাপ না নেব, হজম না করব, তবে কে করবে?" ''ঠাকুর কি এবার খালি রসগোল্লা খেতেই এসেছেন?"[৮০] ই টি স্টার্ডির কাছে পাঠানো স্বামীজীর চিরন্তন আশীর্বচন : ''এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে তোমায় সাহায্য করার জন্য আমি সহস্রবার শরীরত্যাগে প্রস্তুত।"

সেই ভাবসাগরে সুস্নাত ভাবময়ী নিবেদিতা। পূর্বপরিচয় সম্পূর্ণভাবে বিলীন করে আত্মপরিচয় দিতেন স্বীয় জীবনের নিষ্কর্ষসত্য একটি বাক্যবন্ধে—'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'। এ যে কতখানি জীবন্ত সত্য—অন্তহীন ভাবী কালের হাতে রইল তার মূল্যায়নের ভার। *(সমাপ্ত)* ✠

তথ্যসূত্র

৬৫। উদ্বোধন, ৯১ বর্ষ, সংখ্যা ৮০

৬৬। লিজেল রেমঁ, *ভারতকন্যা নিবেদিতা*, অনুবাদ : নারায়ণী দেবী, সোমলতা ২০১৫, পৃঃ ১৬৬

৬৭। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, *ভগিনী নিবেদিতা* (সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল, ১৯৮৫), পৃঃ ১২৯

৬৮। *ভারতকন্যা নিবেদিতা*, পৃঃ ১৬৬

৬৯। দ্রঃ *The Complete Works of Sister Nivedita*, Vol II, (Advaita Ashrama : 1999), p. 335

৭০। Net-site : Dharma Universe LLC Websites

৭১। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *নিবেদিতা লোকমাতা*, খণ্ড ১, পর্ব ১, (আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা,১৩৯৮), পৃঃ ২৩০

৭২। *ভগিনী নিবেদিতা*, পৃঃ ১৩০

৭৩। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয় : ২০০১), খণ্ড ৩, পৃঃ ৭৮

৭৪। স্বামী বিবেকানন্দ, *পত্রাবলী*, (উদ্বোধন কার্যালয় : ২০০০), পৃঃ ৫৮৫-৮৬

৭৫। তদেব, পৃঃ ৬৭০-৭৩

৭৬। তদেব, পৃঃ ৬৬৭

৭৭। তদেব, পৃঃ ৬৩১

৭৮। তদেব, পৃঃ ৭৩২

৭৯। স্বামী প্রভানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা, খণ্ড ২ (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৭), পৃঃ ১০৫

৮০। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা* (উদ্বোধন কার্যালয় : ২০০৫), পৃঃ ৭৮, ৩৩৬